আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি

আজাদ আলম

সিডনির সুবিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক অপেরা হাউজকে ডানে রেখে, এই শহরের আর এক দর্শনীয় স্থাপত্য হারবার ব্রিজের উপর দিয়ে সামনে এগোলেই আসবে প্যাসিফিক হাইওয়ের এগজিট। রিভার রোড প্যাসিফিক হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে চলে গেছে লেইনকোভ রিভারের দিকে। উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা একহারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে মনে হবে এটি একটি শুকনো ঠনঠনে নদী পথ। এই রাস্তার দু'পাশে নর্থ সিডনির ধনে ধনাঢ্য সব এলাকা। টম্বারীন বে রোড রিভার রোডের আড়াআড়ি। ডানে টার্ন নিয়ে টম্বারীন বে রোড ধরে কিছু দূর এগোলেই নাগাল মিলবে ইয়াম্বলী স্ট্রীট আর টালিবান রোডের। সেইন্ট ইগ্নেসাস কলেজের বিশাল গেটটি অনায়াসে চোখে পড়বে টম্বারীন বে আর রিভার ভিউ রোডের গোল চত্বর পেরুলেই। যেমন বিশাল দরজা তেমনি বিশাল এই প্রাইভেট কলেজটির আয়তন। রিভার ভিউ সাবার্বের প্রায় অর্ধেকটা জুড়েই এর সগৌরব অবস্থান।

স্কুল টিমের ক্রিকেট খেলার সূত্র ধরে এই কলেজে দ্বিতীয়বার আসা। এই টিমের স্থির মস্তিষ্কের ধীর গতি সম্পন্ন ফার্স্ট বোলার আমার ছেলে। কলেজের এই বিরাট চত্বরে নদী, পাহাড় আর বন ঘেরা ৪ নম্বর ক্রিকেট মাঠটি খুঁজে পেতে বেশ কষ্টই হোলো। ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে মাঠের আশে পাশে থাকলাম না ছেলের অনুরোধেই। দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকলে ওর বোলিং পারফরমেন্স নেতিয়ে পরতে পারে এই আশঙ্কায় আমাকে আগে থেকেই হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে মাঠের ত্রিসীমানায় যেন অবস্থান না করি। বিনা বাক্যব্যয়ে কথা রেখেছিলাম অন্য কারণে। সেন্ট ইগ্নেসাস কলেজের দুর্দান্ত চারের মার দেখার চেয়ে আমার আকর্ষণ ছিল লেইনকোভ রিভার, রিভার ভিউ এবং লিনলি পয়েন্ট এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা।
নদী ঘেরা,সবুজাভ এই সাবার্ব গুলোতে আদিবাসীরা হাজার বছর ধরে বাস করলেও আজকাল তাদেরকে চোখে পড়ে না। ইউক্যালিপটাস,গাম,লিলি-পিলি গাছের ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠা ধনবান মানুষদের বসতিগুলো ঝোপের আড়ালে যেন বাবুই পাখীদের নিখুঁত ঠিকানা। নদী এবং উপসাগর ঘেঁষা পরিপাটি এই বাসাগুলো, লেইনকোভ রিভার, টম্বারিন বে এবং বার্নস বে'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করেছে আরও বিস্তারিত।
গাড়িটা পার্ক করলাম টম্বারিন বে রোডের শেষ মাথায়। পাশেই রিজার্ভ। টম্বারিন বে রিজার্ভের ভিতর দিয়ে পায়ে চলা এবড়ো থেবড়ো পথ। ডানে সেন্ট ইগ্নেসাস কলেজের বাউন্ডারি আর বামে শান্ত ছায়াঘেরা টম্বারিন বে। তার বুকে ভাসছে ছোট ছোট মাছ ধরার নৌকো, প্যাসিফিক ব্ল্যাক ডাক, এবং লাল লেজের ফায়ার-টেল পাখী। একটা নৌকো থেকে ভেসে আসছিল গিটারের টুং টাং মিষ্টি শব্দ। ছোট বড় পাথর টপকিয়ে রিজার্ভের বেশ ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম একপ্রকার মোহাবিষ্ট হয়েই। পাতার মর্মর শব্দ,পাখীর কিচির মিচির আর জনশূন্যতা সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন রেইন ফরেস্টে বিচরণ করছি। কখন যে একটা ঘণ্টা চলে গেছে টের পাইনি। সূর্যটা মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ার সাথে সাথে দমকা বাতাসের বেগ খানিকটা বেড়ে গেল। ভয় পেয়েই তড়িঘড়ি জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে সোজা উপরে উঠে আসলাম ভিক্টরি রোডের ফুটপাতে।

উঠছি নীচ থেকে উপড়ে। পাহাড়ি পথ বাঁক দিয়ে উঁচুতে হারিয়ে গেছে। ঘড় ঘড় বিকট আওয়াজ করে স্টেট বাসটা পাশ কাটিয়ে উধাও হয়ে গেলো আর এক বাঁকে। সামনে তাকাতেই চোখে পড়লো ট্রলি ব্যাগ সহ এক বৃদ্ধা ধরাশায়ী। সম্ভবত বাস থেকে নেমে দমকা বাতাসের বেগ সামলাতে পারেনি। দৌড়ে এসে সাহায্য করার আগেই বৃদ্ধা আমাকে ইংগিত করলো ইংরেজিতে,
"আমাকে নয়, আমি ঠিক আছি,পারলে গণ্ডগোলের হোতা ঐ গোলগুলোকে ধরো। দেখছো না কি রকম দৌড়ে পালাচ্ছে। ওদেরকে সামলাতে গিয়েই তো আমার এই নাস্তানাবুদ অবস্থা।"
ততক্ষণে এভোকাডো, গোল্ডেন ডেলিশাস আপেল এবং ক্যালিফোর্নিয়ান অরেঞ্জগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ঠাঁই নিয়েছে। হেটে যেতে চাইলেও একপ্রকার দৌড়ে গিয়ে ওগুলোকে পাকড়াও করে উপরে উঠছিলাম।
বৃদ্ধার ব্যস্ত সমস্ত চিৎকার,
"না না উপরে আসতে হবে না ডিয়ার, আমাকেই নীচে নামতে হবে।"
বৃদ্ধা হাঁটা দিয়েছে ঢালুর দিকে। এগিয়ে এসে সাহায্য করবো কি না, প্রস্তাব দেয়ার আগেই ও বলে উঠলো, "ভাবতে হবে না, আমি ঠিকই তোমার কাছে আসতে পারবো।"
গোলগাল চেহারার পরিপাটি বদনের মহিলাকে এই প্রথমবার ভালো করে দেখলাম। আভিজাত্যের ছাপ চুল থেকে পা অবধি হলেও মুখমণ্ডলে কোন গাম্ভীর্যের ছাপ নেই। সতেজ সাবলীল স্মিত হাসির পরশে চিবুকের বলিরেখাগুলো বিনা বাহানায় লুকিয়ে রেখেছে তাঁর আসল বয়সটাকে।
"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ইয়াংম্যান।"
সদ্য কলোপিত চুলের বদৌলতে ইয়াংম্যান সম্বোধনটা মনটাকে পুলকিত করলো।
"দ্যাটস ওকে, তুমি ঠিক আছো তো? যে ভাবে ট্রলি-ব্যাগের সাথে পাঞ্জা লড়ছিলে।"
হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বললো, আমি সোফিয়া মার্গারেট এডাম, সোফিয়া এডাম নামে সমধিক পরিচিত। এক কালে সুফিয়া আদম নামে পরিচিত ছিলাম। তুমি কি বাংলাদেশী?
কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। সবসময় দেখেছি এদেশীয়রা প্রথমেই ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানী ভেবে নেয় আমাদের আদলের কাউকে দেখলে।
"জাতে বাঙ্গালী, জাতীয়তায় বাংলাদেশী। তুমি কি করে বুঝলে আমি বাংলাদেশী হতে পারি? আমার চেহারা বা বেশভূষায় কোথাও 'কি মেইড ইন বাংলাদেশ' লেখা আছে?"
"আছে মাই ডিয়ার আছে, সামহয়ার ইন হিয়ার অর দেয়ার। "নিজের এবং আমার বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে হাস্যোজ্জল চোখে তাকিয়ে কথাগুলো বললো।
"সেটা কি রকম শুনি।"
"জানতে চাইলে আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিতে হবে যে।"
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত, এই মহিলার রহস্যময় অথচ আদরে ভরা আহবানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।
যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তার উলটো দিকে সোফিয়ার বাসা। নাম লোটাস হাউস। আমাকে ড্রয়িং রুমে বসতে বলে সোফিয়া হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হতে বাথরুমে গেল। বিশাল রুমের চার দেয়াল এবং সংলগ্ন ফ্লোর স্যুভিনিরে ঠাসা। মাঝে ভেলভেটের সোফা সেট। ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের কলোসিয়াম থেকে শুরু করে বার্মার বুদ্ধ প্রতিকৃতিও ঠাঁই পেয়েছে তার কালেকশনে। ঘুরে ঘুরে দেখতেই দৃষ্টি আটকে গেল একটা কোনায় এসে। নাম তার বাংলাদেশ কর্নার। সবার উপরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের ফ্রেমে বাঁধা ক্যানভাস। তার নীচে

বাঁশের তৈরি মিটার খানেক লম্বা পাল তোলা নৌকা। পাশের প্রায় পুরোটা জুড়েই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের প্রতিকৃতি। এক হাত উঁচিয়ে স্বাধীনতার ডাক। তার নীচে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ী, দুর্গা পূজা মণ্ডপ এবং কলসি কাঁখে গায়ের বধূ। ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম কতক্ষণ জানি না। এত যতনে সাজিয়ে রেখেছে বাংলাদেশের ইতিহাসকে। সম্বিত ফিরে পেলাম সোফিয়ার প্রশ্নে,

“এখন কি বুঝতে পেরেছো, প্রথম দেখাতে তোমাকে বাংলাদেশী বলে ভেবে নিয়েছিলাম কেন?”

“তুমি বাংলাদেশে নিশ্চয়ই কিছুটা সময় কাটিয়েছো?” আমার প্রশ্ন।

“কিছুটা নয় বলো কিছুকাল, জীবনের কয়েকটা উৎকৃষ্ট সোনালী বছর। তাইতো বাংলাদেশকে লালন করি মনের মাঝে অনেক যত্ন করে। বলতে পারো বাংলাদেশ আমার সেকেন্ড হোম। উনসত্তরের গন অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে, ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিন পর্যন্ত সমস্ত প্রধান প্রধান ইভেন্ট গুলোর আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শিনী।

সোফিয়া শুরু করলো তার বাংলাদেশে বসবাসের কথা। স্বামীর মিশনারি মিশনের সূত্র ধরে সোফিয়ার বাংলাদেশে জীবন যাপন। ৬৯ এর প্রথম দিকে তাঁর স্বামীর সাথে ময়মনসিংহ জেলায় মিশনের কাজ শুরু করে। এক ছেলে এক মেয়ের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার হালুয়া ঘাটে। ধানমন্ডির ১৬ নম্বর রোডের এক ভাড়া বাসায় কেটেছে ৭১ এর দিনগুলো। চার বছরে অনেকটাই বাংলা রপ্ত করে নিয়েছিল সোফিয়া। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতক্ষ্যদর্শিনী সোফিয়া। গর্ব আর গাম্ভীর্যের সাথে সোচ্চার গলায় উচ্চারণ করলো বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণের শেষ কটা লাইন। আমি শুধু অবাক হয়ে শুনছিলাম তার কথাগুলো। একজন বিদেশিনীর বাংলাদেশের জন্য কি পরিমাণ ভালোবাসা থাকলে এত গভীর শ্রদ্ধাভরে আমার দেশের গর্বের কাহিনী রক্ষণ করে এবং ধারণ করে রাখে স্মৃতির কোঠরে ভাবতেই ভালো লাগছিলো। সে বললও, তার এই ৮ নম্বর ভিক্টরি রোডের বাসাটির নাম ছিল ‘এডামস হাউস’। পালটে রেখেছে ‘লোটাস হাউস’। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল ‘শাপলা’ ফুলের অনুকরণে। হাসতে হাসতে জানালো, “এ হলো বিজয় সরণীর পদ্ম বাড়ি। লোটাস হাউস অফ ফ্রীডম স্ট্রিট। স্মৃতির গভীর বন্ধনে বাঁধা সোফিয়ার বাংলাদেশ প্রীতি আমাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে তুলছিল।

সোফিয়া যেন একজন আপন দেশের মানুষকে খুঁজে পেয়েছে অনেকদিন পর। আবেগতারিত হয়ে বলেই চলেছে স্মৃতি কথা।

“আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে, ৭০ এর উৎসব মুখর নির্বাচনে, ৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষণে এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গন সঙ্গীত আর চরমপত্র ছিল আমার প্রিয় অনুষ্ঠান। কতদিন কত রাত আশায় আশায় ছিলাম যদি কোন গেরিলা যোদ্ধা আসে আমার ঘরে, একটু সময়ের জন্য, এক আঁজলা পানির জন্য, কি সৌভাগ্যই না হোতো আমার। একজন মহান মানুষের সাথে দু’দণ্ড কথা বলতাম, জানতে চাইতাম তাঁদের গগনচুম্বী বীরত্ব-গাঁথা। নিজের অজান্তেই আমি তখন বাঙ্গালী মনে প্রাণে। তোমাদের বিজয় দেখেছি ১৬ই ডিসেম্বরে। যোগ দিয়েছিলাম বিজয় মিছিলে, শাহবাগ থেকে পল্টন ময়দান পূর্ণত্ব। সে সময়টা ছিল আমার জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। আমার তখন মনে হতো এই বাঙ্গালীরা যারা যুদ্ধ করে, রক্ত দিয়ে, সম্ভ্রম দিয়ে যে দেশকে স্বাধীন করলো, সে দেশটা তো আমার ছেলে মেয়েরও প্রিয় জন্মভূমি। এ বিজয় তো আমারও রক্তের বিজয়।”

আমি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, আমি কি পারছি এতটা উচ্ছল আবেগ দিয়ে বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে লালন করতে। পারছি কি আমাদের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস আর শহীদ দিবসকে অকুণ্ঠ চিত্তে পালন করতে।

সোফিয়া হাঁপিয়ে উঠেছে এক নাগারে এতগুলো কথা বলে, সঙ্গত কারণেই থামলো কিছুক্ষণ।

“থামলে কেন সোফিয়া”? বলতেই থাকো। অশীতিপর বৃদ্ধার স্মৃতিচারণে আমি এতটাই আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে মনের অজান্তেই কথাগুলো বলে ফেললাম।

“সরি মাই ডিয়ার, আই ওয়াজ এক্সাইটেড” দেখো তো তোমাকে এভেন চা অফার করতেও ভুলে গিয়েছি, সরি ডিয়ার।”

বললাম, “ব্যস্ততার কিছু নেই আমি রোজা পালন করছি।”

“ও আচ্ছা এটা তা হলে রমজান মাস। পাড়া পড়শিদের পাঠানো ইফতার কাহিনী না বললে তো গল্পটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সে তোমাদের আর এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতির কথা।”

এমন সময় ছেলের এস এম এস ভেসে উঠলো মোবাইলে।

“আব্বু, কাম শার্প। লস্ট এগেইন, ওয়েটিং এট দি লস্ট কর্নার।

অনিচ্ছা সত্যেও দু‘জন দু’জনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম একখণ্ড বাংলাদেশ থেকে। যা সাজিয়ে রেখেছেন জনৈক বিদেশিনী তাঁর পদ্মবাটিতে। মনের মধ্যে বাজতে থাকলো গভীর মমতায় বাঁধানো, আবেগে উচ্ছ্বাসে গর্বে ভরা একটি লাইন, “আমি ধন্য, আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি।”